রেফারি

অনুপ মহারত্ন

অনেক দিন আগে কোন এক বিয়ে বাড়ীতে এই গল্পটা মামার কাছেই শুনেছিলাম, খুব সম্ভব বিয়েটা মাসতুতো বোনেরই হবে, জায়গাটা ঠিক মনে পড়ছে না। কলকাতা বা দিল্লী, কোন এক শহরে হবে, গল্পটা মনে আছে, তার কারন গল্পটা শুনে আমরা ভাই বোনরা হাসতে হাসতে মাটিতে এতো গড়াগড়ি দিয়ে ছিলাম যে , শেষে মামা কে ধমক দিয়ে আমাদের হাসি থামাতে হয়েছিল। জগতে অনেক কিছুই ভুলেছি , কিন্তু এ গল্প ভুলিনি, অবশ্য ভোলার কথা ও নয়, আশা করছি বাকী জীবনটা তে এ রকম মনোরম আলেখ্যে স্মৃতিতে রয়ে যাবে।যদি আমি অনেক দিন বাঁচি, এবং বৃদ্ধ বয়েসে যদি কখন ডেমেনশিয়া অর্থাৎ স্মৃতি ভ্রংশে ভুগি এবং ডাক্তার যদি জিজ্ঞাসা করেন, “ আপনার কি আর কিছুই মনে পরে না?’’ তার উত্তরে, নিশ্চিত আমি আগাম বলতে পারি , “ আছে ডাক্তার- বাবু, মনে আছে, বলতে পারেন একটি জিনিসই মনে আছে, মামার সেই গল্পটা” । আমি জানি জরা ও হার মানবে ,প্রতিটি দেহ কোষে গল্পের কথা গুলো যেন গেঁথে আছে । এ স্মৃতি আমার কোন দিনই মুছে যাবার নয়।

পরে চিন্তা করে দেখলাম, ইহ লোক ছেড়ে তো চলে যেতেই হবে, তালে
ভাবী কালের নতুন পাঠককূল কে একটু জানিয়ে গেলে ক্ষতি কি! জিভের রসনা ক্ষণিকের , মনের রসনা চিরকালের । সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নিল এই গল্প লেখার প্রয়াস।তবে বলে রাখি মামার গল্প শোনা আর আমার লেখা এক জিনিস নয় । কেও যদি বলে শম্ভু মিত্রের অভিনয় লিখছি সেটা শুনতে যেমন হাস্যকর তেমনি মামার গল্প বলাটাও ! মামাকে বাদ দিয়ে মামার গল্প মানে গল্পের এক তৃতীয়াংশ । মামা যে মামার গল্পের কতটা অংশ জুড়ে থাকে তা অনুমান করা সত্যি ই কঠিন । সে চিত্র আমি দিতে পারব না, আমার দুর্বল লেখনী শক্তি মামার গল্প বলার ঐশ্বরিক শক্তিকে ব্যক্ত করা অসম্ভব!তার কারণ, এতো নিছক গল্প বলা নয় যা আমরা ড্রয়িং রুমে প্রত্যহ বসি দেখি এবং শুনি ।আবার এটা ঠিক গল্প পাঠ ও নয় , বরং সাহিত্যের ভাষায় বলা যেতে পারে একাঙ্ক নাটক । এ রকম উজ্জ্বল চেহারায়, সুললিত চোখে, অপূর্ব ভরাট গলায়,তামাকু পানের রক্তিম অধরে, স্মিত হাসি নির্গত মামার কথাগুলো যখন শুনতাম তখন মনে হতো না গল্প শুনছি , মনে হতো যেন গল্প দেখছি । একটু সংস্কার করে বলা যায় ঘোষালের গল্পের যেন নাট্য রূপ লাইভলি দেখতে পাচ্ছি, সে যে কি অসাধারণ ! কি করে বোঝাই আপনাদের । অনেকেই প্রশ্ন করবেন ঘোষাল টা কে? ঘোষাল একজন বিখ্যাত গল্প বলিয়ে, তাকে অবশ্য কোন দিন আমরা আমাদের বাড়িতে পাই নি, তাকে আমরা পেয়েছি চৌধুরীর বাবুর গল্পে, সে গল্প পরে হবে এখন মামার গল্পে আসা যাক ।

মামার গল্প বলার একটা স্টাইল ছিল । মামা সব সময় বেতের চেয়ার বা
সোফায় বসে গল্প বলত,আমরা তাকে ঘিরে ভাই বোনরা বসতাম। সোফার ডানদিকে থাকতো রেকাবিতে পিতলের পানের ডিব্বা আর জল, আর বা দিকে একটা পিকদানী। একদমই সাদা মাটা একটা ঢাকনা দেওয়া ঘটি সদৃশ পিতলের ছোট বাসন মামা বড় ডাক্তার ছিল ঠিক কথা, কিন্তু বিলাসিতা বা বৈভবের লেশ মাত্র ছিল না যে টুকু আভিজাত্য আমরা দেখেছি তার চেহারা ও কথায়, বৈষয়িক আসবাবে নয় । সামনে ছোট টি টেবিল, বড় কাপে গরম চা, টেবিলের একদিকে মামা, অপর দিকে উপবিষ্ট আমরা ভাগ্নে ভাগ্নীর দল । সেই গল্পের আসরে শুধু ভাগ্নে ভাগ্নীর দলই থাকত, তা নয়, সেখানে মামার ভগ্নী, ভগ্নী- পতিরা ও থাকত অর্থাৎ আমাদের মাসি মেশো র দল,সম্ভবতঃ বাড়ির কোন সদস্যই বাদ যেতো না সে যে বয়সেরই হোক! পাঠক বন্ধুরা হয়তো বিশ্বাসই করবেন না কিংবা অবিশ্বাস্য লাগবে, সেই আসর ঘরে আমি আরো যাদের কে দেখেছি তাদের মধ্যে কেও কেও, বাড়ির কাজের লোক, এমনকি কাজের মাসিরা ও থাকত, কেও হয়ত ফুল ঝাড়ু হাতে, কেও বা লুচি করার বেলচা নিয়ে দাঁড়িয়ে ।মামা যেখানে আসর বসাত সেই ঘরে যদি কেও হঠাৎ ঢুকে পরত তালে আর বেরতে পারত না, যত কাজই হাতে থাকুক না কেন! গল্প শোনার চৌম্বক শক্তি যেন ধরে রাখত, পরে থাকা গৃহের বাকী কাজগুলোকে অর্থহীন মনে হত । নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান আমরা সবাই শুনেছি,

কিন্তু মামার গল্পের যে অপূর্ব নৈসর্গিক টান ,তাতো অঙ্ক কষে বোঝানো যাবে না ।
আবার কোন দিন দেখানো ও যাবে না, তার কারণ মামা আর ইহ লোকে নেই ।

এবার গল্পের আসরে আসা যাক। আস্তে আস্তে ঘর
যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, উকি মারার সংকীর্ণ স্থান টুকু যখন থাকে না , তখনই গল্প শুরু করার সব থেকে প্রশস্ত সময় । আসরে কান্নারত যে কোন শিশুর প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। সে যারই হোক না কেন!সামনে উপবিষ্ট,কৌতূকপ্রিয়,বাক্যহারা শ্রোতৃমণ্ডলী,তারই মাঝে অভ্যাস মত পানের বোটাতে চুন লাগিয়ে, পিকদানীটা ঠুং করে নিচে রেখেই , মামা, ‘ বুঝলি ’ বলে গল্প শুরু করল । পাঠক বন্ধুদের বলে রাখি মামার গল্প বলার আরম্ভটা সব সময় ‘ বুঝলি’ কথাটা দিয়েই শুরু করত ।এ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি । গল্প বলার শিল্প নৈপুণ্যে বুঝলি কথাটির কি তাৎপর্য আজ ও আমি বুঝে উঠতে পারিনি । আপনারা কেও বুঝলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন ।

গল্পঃ ---

“ আমি তখন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ি । ফাস্ট ইয়ার । থাকতাম
বেহালায় । তৎকালীন বেহালা আর আজকের বেহালা অনেক তফাৎ ।তোদের তো জন্ম আর ও অনেক পরে । কম করে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার কথা । এখনকার মত তখন বেহালা অত ঘিঞ্জি ছিল না, বেশ ফাঁকা ফাঁকা, বড় বড় মাঠ ,ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা, সেই সঙ্গে দীঘি, খাল বিল পুকুর ও ছিল । বেহালা কে তখন জলা জায়গা বলেই লোকে জানত । কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়, অথচ নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতা তাকে গ্রাস করেনি। দেশ বিভাজনে, বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসীদের নিয়ে গড়ে উঠা নতুন জন বসতি। বর্ষাকালে বেহালার চিত্রটা অন্যরকম, জল জমে রাস্তা ও পুকুর এক হয়ে যেতো । সে যে কি উদ্ভূত দৃশ্য কি করে বোঝাই তোদের । চলার পথে রাস্তার কোন অংশই শুকনো নয় যে একটু একে বেকে গিয়ে পার হয়ে যেতে,পারি , গোটা রাস্তাটাই জলে ডুবে থাকত, মানুষের দিন রাত বর্ষায় বিরাম হীন হাঁটার ছপ্‌ শব্দ আজ ও যেন শুনতে পাই । আমি যে পাড়ায় থাকতাম, সেটা ছিল শ্রীপ্ললী । বাস স্ট্যান্ড থেকে অনেক দূর ।কলেজের বাস ধরতে হলে অনেকটা হাঁটতে হত । রাস্তার অবস্থা ছিল দুর্বিসহ ।কাঁচা রাস্তা, অবিন্যস্ত ইট পাথর ফেলা, এবড়ো খেবড়ো, খানা খন্দ যুক্ত এ রকম মনুষ্য পথ আমি আর ভূ ভারতে পাই নি। অনেক পাঁক দিয়ে দিয়ে বড় রাস্তায় উঠা এ যে কি ভয়ংকর পায়ে চলা পথ , ভূগোলের ভাষায় বলা যায় অভিযান, ভাবলে এখন ও শিউরে উঠি! কি করে বুঝবি তোরা ,বর্তমানে তার কোন চিহ্নই নেই । পাহাড়ের ট্রেকিং কথাটা অল্প বিস্তর আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ভূ-প্রকৃতির জগতে, সমতল ভূ-পৃষ্ঠে, রাস্তায় হাটলেও যে ঐ রূপ ট্রেকিং এর অভিজ্ঞতা হয় সেটা বেহালা বাসী ছাড়া পৃথিবীর আর কেও জানতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই । শ্রীপল্লী খুব ছোট পাড়া, নামটা সুন্দর , সেন পল্লীর পাশেই । সেন পল্লীর ভৌগলিক পরিচয়ে শ্রী পল্লীর অবস্থান মানুষ বলতে হত । শ্রীপল্লীতেই আমার দিদি জামাই বাবুর বাড়ি । তখনকার দিনে সেটাই ছিল আমার একমাত্র আস্তানা । কি করে হল সে কথায় আসি । সত্যি কথা বলতে কি হোস্টেলে থাকার আর্থিক সামর্থ্য বাবার ছিল না । না থাকারই কথা, আমরা ছিলাম দেশ ভাগের সর্বশান্ত, ছিন্নমূল একটি দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবার । বাবা সরকারী পুনর্বাসন বিভাগে কাজ করতেন, মাইনে ও খুব বেশী ছিল না, বড় সংসার , সেই সঙ্গে জেঠতুতো ভাইদের ও দেখতে হতো । বাবা তো এক রকম ঘোষণাই করেছিলেন তিলকের ডাক্তারি পড়ান যাবে না, এতো খরচ বহন করা সম্ভব নয় । তিলক যে আমার ডাক নাম, সে কথা আর নতুন করে বলার দরকার নেই । দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু ছাত্র খারাপ ছিলাম না, ভর্তি হওয়ার পরই স্কলারশিপের জন্য আবেদন ও করেছিলাম, একটা জিদ আমার ছিল, ডাক্তারি আমাকেই পড়তেই হবে, সেটা যেরম করেই হোক । সমস্যা একটা ছিল, একদিন কলেজের অফিসে খবর নিয়ে জানলাম স্কলারশিপের টাকা সরকারি কোষাগার থেকে আসতে নাকি প্রায় এক বছর সময় লাগে ।এদিকে আবার সারা বছর বাকী রেখে হোস্টেল, মেসে থাকা যায় না । ডাক্তারি পড়া নিয়ে আমার জীবনে বড় একটা প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দেখা দিল। এ রকম অভূতপূর্ব আর্থিক সংকটের হাত থেকে উদ্ধার করলে বড় জামাই

বাবু! সত্যি কি বলব! বড় জামাই বাবু পাশে না দাঁড়ালে আমার ডাক্তারি পড়া হত না । বাবাকে একদিন বললেন ,“ এটা আপনি কি কইতাসেন, তিলকের ডাক্তারি পড়া কখনই বন্ধ করা সাবে না, ও আমার কাস থেকেই পড়বে” । সেই থেকে বেহালা বাসা, নিজের বাসা হয়ে দাঁড়াল । মনে হল এক নতুন জীবন পেলাম সেই সঙ্গে যুক্ত হল এক অনির্বচনীয় হৃদয়ের স্পন্দন । শ্রী পল্লী, সেন পল্লী,ব্রাহ্ম সমাজ রোড , ইউনিক পার্ক,দেবালয়, মেন্টন, ট্রাম ডিপো, এমন কি বেহালা বাজার —সব যেন আমাকে আপন করে নিল, আমি ও সব কে বড় আপন করে দেখলাম,স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম সকলের সঙ্গে আমার ও যেন সম্পূর্ণ ভাবে আত্মীকরণ ঘটেছে । তখন আর ওই কথা মনে হলো না, পুনবার্সন বিভাগের একজন স্বল্প বেতনের এক দরিদ্র কর্মচারীর সন্তান । বরং বেহালার পানা পুকুর, কাঁচা রাস্তা, অজস্র গাছপালা, বাঁশ ঝাড়, আঁশফল, জামরুল, রাত্রে ঝিঝিপোকার ডাক, সেই সঙ্গে অপূর্ব এক নৈসর্গিক গ্রামীণ স্নিগ্ধতা আমাকে একটা মোহের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলল। ,দিন দিন বেহালা যেন নিত্যদিনের কর্ম জীবনে, আমাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরল । একদিকে কলেজের ডাক্তারি পড়ার চাপ আরেক দিকে ফুটবল খেলার উন্মাদনা --- যুগপৎ ঘটনাই বেহালা বাসের নব অঙ্কুরিত নতুন যৌবনের স্মৃতি আজ ও আমার প্রৌঢ় জীবনের শেষ অধ্যায়ে উজ্জ্বল ভাবে উন্মীলিত, চোখে যেন ছবির মতোই ভাসছে, কখনই যেন আবছা হয় না ।বেহালা বাস যদি ও আমার জীবনের এক বছরের বাস ,তারপর আমি হোস্টেলে চলে যাই, তবু ও সেই এক বছরের অপরূপ স্মৃতি, আমার বহু বছরের জীবনকে আঁকড়ে আছে , আজ ও তার টান অনুভব করি । আজ না মুছে যাওয়া স্মৃতির কিছু অংশ তোদের বলব বলে বসেছি , “আরে কে আছিস, এই তপতী , একটু চা করে নিয়ে আয় তো । গলাটা একটু ভেজাই । এই শুনছ নাকি? একটা ছোট পান তৈরী করে নিয়ে এস ! গল্পটা শেষ করেই স্নানে যাব ।”

আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, তপতী আবার কে ? তপতী হচ্ছে, মামারই এক
ভগ্নী । আমাদের রাঙ্গামাসি । “এই শুনছ “ কথাটা র নিশ্চয় বিশদ ব্যাখ্যার দরকার নেই , প্রত্যেক বাঙালিই জানে, স্বামী কর্তৃক ভার্যার নিকট খুবই শ্রুতি মধুর একটা ফরমায়েশি ডাক । এই শুনছ যে আমাদের প্রিয় মাইমা, সেটা বলা বাহুল্য । চা এর পর পান মুখে দিয়ে, জিভে একটু চুন গিয়ে , “ কি যেন বলছিলাম, ফুটবল খেলা, ওহ ! মনে পরেছে , ঠিক আছে ! তালে বুঝলি ” বলে মামা আবার শুরু করল।

“ একদিন, জুন মাসের মাঝামাঝি সময়, বাইরে বেশ ভাপসা গরম, বাংলায় আষাঢ় মাস হবে, বেলা বারটা, মিত্র স্যার এনাটমি -র ক্লাস নিচ্ছিলেন, বলা যায় ফাটাফাটি ক্লাস, পিন ড্রপ সাইলেন্স, অপার বিস্ময় নিয়ে আমরা সকলেই স্যারের কথা শুনছিলাম। মানুষের বাইরের দেহটা দেখলে কিছুই বোঝা যায় না, ভিতরের হাড়ের শিল্প নৈপুণ্য এতো আশ্চর্য রকমের সুন্দর , সূক্ষ্ম গঠন ও বিচিত্র কাজের প্রকরণ , মিত্র স্যারের অপূর্ব ভাষণে ,বোর্ডের জীবন্ত অঙ্কনে আমরা প্রত্যেকই যেন আমাদের হাত -পা ওয়ালা সজীব দেহটার মধ্যে উক্ত বর্ণনার যথার্থ তা উপলব্ধি করতে পারছিলাম । মাইকেল এঞ্জেলো কোথায় যেন বলে ছিলেন,” হাত পায়ের এতো নিখুঁত প্রযুক্তি গত শিল্প নৈপুণ্য আর কোথাও নাকি দেখা যায় না ’’। মাইকেল এঞ্জেলো যে কাব্য করেনি , দৈনন্দিন জীবনে আমরা কজন আর ভাবি ,মিত্র স্যারের ক্লাস না করলে হয়ত ও আমি ও জানতাম না । এমন সময় জানলা দিয়ে কে যেন বলে উঠল, “ তিলক আছিস নাকি?” শুনে চমকে গেলাম । চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম আমার দিকে কেও তাকাচ্ছে কি না! কোন বন্ধুই যখন আমার দিকে তাকাল না, তখন বুঝতে আমার অসুবিধা হলো না, আমার ডাক নাম যে তিলক আমার কোন বন্ধুই জানে না । এবং ওই ডাক যে কেবল আমাকে লক্ষ্য করে সেই ব্যাপারে আর সন্দেহ রইলো না । জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, ঠিকই, ছোটু দাঁড়িয়ে আছে । বেহালার সেন পল্লীর ছেলে। ঈশারায় বললাম,একটু দাঁড়া! সে সময় দেখি মিত্র স্যার বোর্ডের দিকে মুখ ফিরে কারপেলের ছবি অর্থাৎ কব্জির হাড়, খুবই নিবিষ্ট মনে এঁকে চলেছেন,আমি ও সর্ন্তপনে, টু শব্দ না করে বেরিয়ে গেলাম । ছোটুকে বললাম,” কি ব্যাপার ? হঠাৎ এই সময়ে! কেও অসুস্থ নাকি? চল ক্যান্টিনে চল” । ছোটু বলল, “ না,না ,তা নয়, অমলদা আমাকে পাঠাল তোকে যেন নিয়ে যেতে , বেশী দেরি করা যাবে না, টুরনামেন্টের খেলা, হঠাৎ করে আজকেই আমাদের ডেট পরেছে “।

অমলদা আমাদের ইউনিয়ন ক্লাবের, যুগপৎ প্রেসিডেন্ট এবং ফুটবল
কোচ, । খেলার জগতে ওনার অবদান অতুলনীয়! ম্যাচ, টুরনাম্যান্ট সব ওনি দেখতেন, মায় খেলার খরচ ও ! ছোটুর কথায় বুঝলাম, আজ বড়িশা স্পোরটিং ক্লাবের সঙ্গে খেলা পরেছে , বিকেল চার টেতে হাজিরা । আমি বললাম, কোথায় হবে? ছোটু বলল “যুগী বটতলার মাঠে” । আমি বললাম , “চল একটু খেয়ে নিই, খালি পেটে আর যাই হোক ফুটবল খেলা যাবে না । প্রথম দিনেই একটা শক্ত টিমের সঙ্গে খেলা পরেছে, কি কপাল? কি হবে কে জানে, ছিটকে বেরিয়ে যাব হয়ত !” ছোটু বললে, “ তিলক অত ভয় পাচ্ছিস কেন?নকআউট গেম নয়, যে হারলে বেরিয়ে যেতে হবে । ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকছে । তাড়াতাড়ি কর ঠিক সময়ে পৌঁছাতে হবে, পুলিনের দোকানে সব জড়ো হয়েছে , চল গিয়ে দেখবি “। আমি বললাম,” ঠিক আছে পৌছে যাব, খাওয়া তো হয়ে গেছে , চল এবার একটা পান খেয়ে বাসটা ধরি ।”

প্যাচপ্যাচে গরম ত ছিলই, মেঘ ও আছে, আষাঢ় মাস, বলা যায় না বৃষ্টি ও
হতে পারে, আমরা তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে বেরিয়ে পার্ক সার্কাসে গিয়ে বেহালা গামী বাসে আমরা উঠে পরলাম, কপাল ভাল পিছনের দিকে জায়গা পেয়ে গেলাম ।বাসে উঠেছি আর বৃষ্টি টিপ টিপ করে শুরু হল , আমি বললাম, ছোটু, খেলাটা আজ ভেস্তে যাবে মনে হচ্ছে । “ ছোটু, বললে, “আরে বৃষ্টি তে ভয় পাচ্ছিস কেন, জল ত একটু জমবেই, কালকে তো ভালই বৃষ্টি হয়েছিল, আমরা তো অভ্যস্ত, জলায় মানুষ, তবে আজকে একটু লড়ে খেলতে হবে । অমলদা বলছিল আমরা দুজনেই ফরওয়ার্ডে খেলব , তুই সেন্টারে আমি রাইট ইন” । দু জনে খেলা নিয়ে আলোচনা করতে করতে কখন যে বেহালার মেন্টনে চলে এলাম, বুঝতেই পারলাম না । মিত্র স্যারের কথা, রুটিনে চারটায় বায়ো-কেমেস্ট্রির ক্লাস - কিছুই মনে পড়ল না, খেলার প্রবল উত্তেজনা আমার সমস্ত সত্তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ,সেই সঙ্গে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । ফুটবল খেলার প্রতি এত অনুরক্তি, এত ভালবাসা, প্রচ্ছন্ন ভাবে মনের মধ্যে এত টা জায়গা নিয়ে বসেছিল আমি ভাবতেই পারিনি! ছোটুর ,হঠাৎ চিৎকারে সম্বিৎফিরে এল, কলেজের ব্যাগ টা নিয়ে লাফ মেরে মেন্টন স্টপেজে নেমে পরলাম । পুলিনের দোকানে সাড়ে তিনটায় দেখা হবে এই বলে দুজনেই দুই পল্লীর দুই প্রবেশ পথে গমনোন্মুখ হয়ে দ্রুত পদ চারণায় স্ব স্ব ভিটায় ফিরে গেলাম ।

পুলিনের দোকানের কথা একটু বলি, না বললে গল্পটা
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ।পুলিনের মত মুদির দোকান, জগতে খুবই বিরল, সংসারের হেন জিনিস নেই যে পাওয়া যেত না, সেই সঙ্গে চা পান বিড়ি , এমন কি মাথা ধরা, পেট খারাপের ওষুধ পর্যন্ত! আজকের দিনে যা অচিন্তনীয় । এটা হল এক দিক । আরেক দিক হল আমাদের আত্মিক দিক । সেন পল্লীর গায়ে একটা পুকুরের পারে,সুরম্য পরিবেশে,পুলিনের দোকানটাই ছিল আমাদের একমাত্র আড্ডার স্থান । কি জানি কেন, মানস পটে আঁকা, এক অপরূপ দৃশ্য আমার অবচেতন মনে বার বার ফিরে আসে, ভুলতে পারি না । শ্রাবণ মাস, ঘন বর্ষায়, টিপ টিপ বৃষ্টিতে,পুলিনের দোকানের লম্পের কম্পমান শিখায়,অস্পষ্ট আলো আধারিতে, দোলায়িত ছায়ায়, সান্ধ্য আড্ডায়, ঘন্টার পর ঘন্টা, যে অনাবিল আনন্দ আমরা পেয়েছি তা অবর্ণনীয়, আবার কখন দেখেছি আমাদের সরল হাস্যোচ্ছাসের ধ্বনিতে পল্লীবাসীর নির্জন রাত্রির আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে । ভাবলে প্রাণ টা এখন ও হুঁ, হুঁ করে উঠে। “ তিলক আরেকটি বার আয়” --এ ডাক যেন এখন ও শুনতে পাই।

বিকেল চারটে, আমরা সবাই যুগী বটতলার মাঠে হাজির ।,অমলদা
ক্রমান্বয়ে আমাদের খেলা সংক্রান্ত টিপস, উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন , ভিজে মাঠ, কি ভাবে আক্রমণকে শাণিত করতে হবে, প্রতিপক্ষের আক্রমণকে ও কি ভাবে মোকাবিলা করতে হবে , খেলায় হারজিৎ আছে, কিন্তু লড়ায়ের স্পিরিট টা ধরে রাখতে হবে । খেলা একটা আর্ট, মারামারি নয়, দক্ষতা ও উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে তুলে ধরা , এটা শুধু আমার নয় প্রত্যেক দর্শকদের ও একই চাহিদা। অমলদা ভাল বলতেন, মনে আছে আজ ও, ওনার প্রতিটি কথা । যখন বলতেন, আমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম । কি যে ভাল লাগত বোঝান যাবে না ।আমি এ রকম লোক দেখেনি, তোরা ও যে, কোন কালে এ রকম লোক পাবি সে আশা ও রাখি না । তখন ও রেফারি এসে পৌঁছায় নি বলে খেলাটা শুরু হয়নি ।মাঠে দেখলাম দর্শকদের বেশ ভীড়

, মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে আছে । আজ স্বীকার করছি , বেহালাবাসীদের খেলা দেখার উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্যিই অপ্রতিরোধ্য!

রেফারি বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে জানিয়ে দিল, আমি মাঠে চলে এসছি, তোমরা দু দলই
এবার নেমে পর। আমরা ও দুটো দল দুটো শিবিরে বিভক্ত ছিলাম, বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই নেমে গেলাম, দর্শকরা করতালি দিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানালে ।টস হয়ে গেল ,আমরা মাঠের উত্তর ফটক পেলাম আর বড়িশা দল মাঠের দক্ষিণ দিক নিল । বৃষ্টি নেই, তবে আকাশে মেঘ ছিল । রেফারি মাঝ মাঠের সেন্টারে বলটাকে বসিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিল, খেলা ও শুরু হল ।

মাঠের কথা আগেই বলেছি, বেশ ভেজা ছিল, কোথাও কোথা
ও জল ভালই জমে ছিল । আমি দেখেছি , মফস্বলের মাঠ গুলোতে , বিশেষ করে পেনাল্টি এরিয়াতে কিছুটা খালের মত জায়গা থাকে, আর বৃষ্টি হলে, অবশ্যম্ভাবী সেখানে জল জমবেই , বেহালার ক্ষেত্রে ও তাই ঘটেছে, জোরে কিক করলে ও, জলে বল পরে আটকে যাচ্ছিল । অনেক সময় ভেজা ঘাসের উপর বল পরে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আবার কাটাতে গিয়ে স্লিপ কেটে পরে যাচ্ছিলাম,একটু সলজ্জ হেঁসে, নিমেষে উঠে পরে আবার দৌড় ।, “ বাঃ বাঃ ,এই তো ভাই, ! চলবে, ” দর্শকদের এই রূপ উদ্দীপক উক্তি গুলো কি ভীষণ অনুপ্রেরণার কাজ করত, বলে বোঝান যাবে না , কথা গুলো এখন ও আমার কানে বাজে । খেলার মধ্যে গতি আনা , ছন্দ রাখা , মনে সাহস ধরা , নেতিয়ে যেন না পরি - এটাই থাকত মূল উদ্দেশ্য ।

খেলা বেশ জমে উঠেছে । লড়াই বেশ সমানে সমানে চলছে ।
উত্তেজনা তুঙ্গে, হবে হবে করে ও কোন পক্ষ ই কোন গোল দিতে পারে নি । প্রথম দিকে আমরা বেশ স্নায়ু চাপেই ভুগছিলাম, বড়িশা যে ভালো টিম সে কথা আগেই বলেছি, এ ক্ষেত্রে উদ্ধার করেছে আমাদের অসাধারণ গোলকিপার, অমলদার নিজের হাতে তৈরী । অমলদার একটা উদ্ভূত প্ল্যানিং ছিল, তার মূল কথা হল, শক্তিশালী টিম কে পরাস্ত করতে পারে একজন শক্তিশালী গোলকিপার। ইউনিয়ন ক্লাবের আর যাই থাক গোলকিপারের সুনাম বহুদূর ছড়িয়ে গেছিল । আজকে বড়িশা দলের ক্ষেত্রে ও বড় ভূমিকা নিয়েছে । সত্যি বলতে কি, আমরা আক্রমণাত্মক ভূমিকা রচনা করে ও খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলাম না! দু বার সুযোগ ভালোই পেয়েছিলাম ঠিক কথা, কিন্তু বড়িশা দলের গোলকিপার দু-বার ই, ঝাঁপিয়ে পরে অবিশ্বাস্য বাঁচিয়েছে ! আমি মাঝ মাঠেই খেলছিলাম । অমলদার সে রকম নির্দেশই ছিল । আমি যে ভালো খেলতাম সে কথা অমলদার কাছে প্রথম জানতে পারি । অমলদা চাইছিল, আমাকে দিয়ে একটু বেশী খেলান , তার কারণ আমার বল কাটানোর স্বাভাবিক দক্ষতা কে কাজে লাগিয়ে, ছোট ছোট পাশে খেলা এবং ব্যূহ রচনা করা - বিপক্ষ কে কোণঠাসা করাই মূল লক্ষ্য ।এইসব স্ট্রেটেজি সব দলেই দেখা যায়, বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের বাকী প্লেয়াররা ও স্ব স্ব জায়গায় ভালোই খেলছিল, নইলে বড়িশার মত দলকে ঠেকা দেওয়া চাট্টি খানি কথা নয় ।

হাফ টাইমের বাঁশি বাজতেই আমরা সব আনন্দে
লাফিয়ে উঠলাম,কেন জানি মনে হল গোল না হওয়াটা ও যেন এক ধরনের জয় ! তখন মনে আসেনি খেলা শেষ হতে আর ও অর্ধেক সময় বাকি । সাইড চেঞ্জ হল,কোন পক্ষই কোন গোল করতে পারেনি - এই নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হল । বুঝতে অসুবিধা হল না উত্তর ফটকের প্রতিপক্ষ বরিশা দল কে এবার গোল করা আর ও কঠিন হবে, পেনাল্টি এরিয়ায় জল বেশ ভালই জমে আছে । এদিকে দর্শকরা অমিমাংসিত খেলা একদম পছন্দ করে না । পেনাল্টি এরিয়ায় বল গেলেই দর্শকরা তারস্বরে চিৎকার করে । যেই দেখে গোল হল না, চিৎকার ও থেমে যায় । এবার একটু মরিয়া হয়ে গোল দেওয়ার জন্য উঠে পরে লাগলাম। মনা ছিল আমাদের রাইট আউট প্লেয়ার । আমি আর মনা নতুন যৌথ উদ্যোগে শেষবারের মত চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হলো কি! বেশ হঠাৎ ই, মনা মাঝ মাঠ থেকে বলটা কে নিয়ে, অনেককে কাটিয়ে, সাইড লাইন ধরে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি ও মাঝ মাঠ থেকে , মনার লাইন বরাবর , দ্রুত দৌড়া ছিলাম, পাশ টাকে ধরার জন্য । পেনাল্টি কিকের লাইন বরাবর

এসে মনা ‘ তিলক’ বলে উঁচু করে বলটা মেরে, সাইড লাইন থেকে পাশ দিল। আমি তখন পেনাল্টি এরিয়ার কাছে এসে পৌঁছেছি । বলটা দৌড়ে ধরতে গিয়ে জলের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম, খুব কাছেই দেখলাম, বলটা জলের মধ্যে পরে ভাসছে, অপর দিক থেকে গোলকিপার ও দেখলাম দৌড়ে এসে বলটাকে ধরতে গিয়ে জলের মধ্যে পরে গেল । আমরা দুজনেই সামনা সামনি জলের মধ্যে শুয়ে , আর বলটা উভয়ের মাঝে ভাসছে । কাছাকাছি প্লেয়ার বিশেষ নেই, দূরে উত্তর ফটকের দর্শক বৃন্দ আমদের দিকে একদৃষ্টি তে তাকিয়ে ছিল,চোখে ছিল উৎকন্ঠার প্রশ্ন, ‘গোলকিপার যখন পরে গেছে, সুবর্ণ সুযোগ! দেখা যাক কি হয়!’

এমন সময় সত্যিই দেখা গেলো । সামনের ভাসমান বলটা হঠাৎ
গোলকিপারের মাথা টপকে ধীরে ধীরে নেটে জড়িয়ে গেল । রেফারি আমার পিছনের দিক থেকে ছুটে আসছিল , নেটে বল ঢুকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দিয়ে গোলের বাঁশী বাজিয়ে দিল । অর্থাৎ ইউনিয়ন ক্লাব এক শূন্য গোলে এগিয়ে থাকল । এই বার্তা দেওয়ার পরই, মাঠের দক্ষিণ প্রান্তস্থ দর্শকবৃন্দ, আমার পিছনের দিকে যারা ছিল, সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল । ছাতা ফুটিয়ে মাঠের মধ্যে সবাই নেমে পড়ল । এমন কি আমার সতীর্থ প্লেয়াররা মাঠের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে,’ তিলক’ , ‘তিলক’ বলে আমাকে ধরার জন্য ছুটতে আরম্ভ করল । এদিকে প্রতিপক্ষ গোলকিপার কে দেখলাম বেশ হতভম্ব,হতবাক, বিস্ময়মৌনী, - প্রশ্ন তুলেছে,” এটা কি করে সম্ভব? বলটা ভাসছিল, হঠাৎ করে ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে গোলে ঢুকবে কি করে? আমি তো প্রত্যক্ষ দর্শী!” সমস্যা বাধালে আমাদের সামনের উত্তর ফটকের গোল পোস্ট নিকটস্থ দর্শক বৃন্দ ,,,সম্ভবত কাছ থেকে ভালই দেখেছে , এ রকম ভূতরে দৃশ্য তাদের কে শুধু অবাক করেছে তা নয় , তাদের কে মারমুখী করে তুলেছে । প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে রেফারি কে বিদ্ধ করে চলেছে , “এটা কি করে গোল হয়? হতেই পারে না! এটা কি হ্যান্ড বল নয়? , ডাক প্লেয়ার কে, গোল তো দূরের কথা!” প্রশ্ন বাণে রেফারি জর্জরিত ।

তখন আমি যে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না,গোলকে ঘিরে আশু গণ রোষ
যে ক্রমান্বয়ে গৃহ যুদ্ধে্র রূপ নেবে সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না । জলের তলা দিয়ে একটি অদৃশ্য হাত, বলকে ঠেলে শূন্য তুলে দিলে, বলটা যে গোলকিপারের মাথা টপকে নেটে মৃদু লয়ে গড়িয়ে গেল, অসহায় গোলকিপার যে সকরুণ,বাক্যহীন, বিস্মিত চোখে পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলে, এ দৃশ্য আমার থেকে ভাল পৃথিবীতে আর কেও দেখেনি! তার কারণ সেই অদৃশ্য হাতটা ছিল আমারই l জয়ের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে অনেক কিছু করে ঠিক কথা যা অনেক সময় দৃশ্যমান নয় । কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ রকম বুদ্ধিভ্রংশ কৌতুকপ্রদ ঘটনা দাঙ্গার রূপ নেবে আমি ভাবতেই পারিনি , একটা ফ্রি কিকেই যার নিষ্পত্তি হওয়ার কথা।

কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, অস্থির চিত্তে,
কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আতঙ্কে, নিরাপদ জায়গার খোঁজে নিজেকে একটা বট বৃক্ষের আড়ালে অর্ন্তধান করলাম , দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি রেফারি কে ঘিরে দুই ভিন্ন মতের সমর্থক শিবিরের মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্ক, কথা কাটাকাটি চলছে, কেও ছেড়ে কথা বলছে না, সেই সঙ্গে যুযুধান দুই দলের প্লেয়াররা ও প্রায় একই রকম বাক যুদ্ধে সামিল ,খেলা ফের শুরু হওয়ার সম্ভাবনা খুব ই ক্ষীণ,ফয়সালা হওয়ার আশা ও ক্ষীণতর, অথচ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী যে অর্থাৎ রেফারি সে কিন্তু অনড় । রেফারি টা ছিল একেবারে কাঠ বাঙাল, এ রকম ঋজু , কৃশকায় চেহারা আমি খুব কম দেখেছি, তার উপর বেশ বয়স্ক , অসম্ভব গোঁ , তীক্ষ্ণ সানুনাসিক, খোনা খোনা গলায় একই কথা বলে যাচ্ছে , “ আমি যখন একবার বাঁশি বাজাইসি, তখন আর ফেরত নিমু না”

মামা গল্প শেষ করে একটু হেসে, গোঁ ধরা বাঙ্গাল রেফারির কথা বলে, বলল, “না বেলা হয়ে গেল, ওঠ, স্নানে যাব” !

একদিন এক পাঠক বন্ধু গল্পটা পড়ে জিজ্ঞাসা করলে , “ঘটনাটা সত্যি নাকি?”
আমি বললাম,” ঠিক তাই “

----------------□------------------------------

maharatnaanup@yahoo.co.in

--